জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০১৪ ৩য় পর্ব, ৩য় সংখ্যা ISSN 2222-5188

ইনফো মেডিকাস

চিকিৎসা সাময়িকী

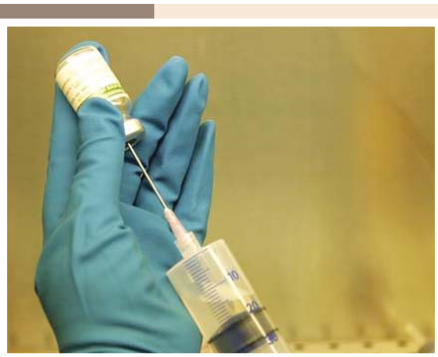

- বিশেষ প্রবন্ধ
- ছবি দেখে রোগ নির্ণয়
- জরুরী চিকিৎসা
- রোগ ও জিজ্ঞাসা
- রোগ ও চিকিৎসা

সূচী

বিশেষ প্রবন্ধ	৩
ছবি দেখে রোগ নির্ণয়	৬
চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্য	৭
জরুরী চিকিৎসা	৮
রোগ ও জিজ্ঞাসা	১০
রোগ ও চিকিৎসা	১১
ব্যবস্থাপত্র লিখন	১৫

সম্পাদক মণ্ডলী
এম মহিবুজ জামান
ডাঃ এস. এম. সাইদুর রহমান
ডাঃ তারেক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম
ডাঃ মোঃ রাসেল রায়হান
ডাঃ তারেক-আল-হোসাইন

প্রকাশনায়
মেডিকেল সার্ভিসেস্ ডিপার্টমেন্ট
এসিআই লিমিটেড
নভো টাওয়ার, ১০ম তলা
২৭০ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা-১২০৮

ডিজাইন
ক্রিয়েটিভ কমিউনিকেশন লিঃ
রোড # ১২৩, বাড়ী # ১৮এ
গুলশান ১, ঢাকা ১২১২

সম্পাদকীয়

সুপ্রিয় চিকিৎসকবৃন্দ,

সর্বপ্রথম ইনফো মেডিকাস - এর দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আপনাদের সমর্থন ও সর্বাত্বক সহযোগিতার জন্য এসিআই পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। চিকিৎসা বিজ্ঞানের আধুনিক এবং যুগোপযোগী সব তথ্যের মাধ্যমে আপনাদের জ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধ করাই এই চিকিৎসা সাময়িকীর উদ্দেশ্য।

এই সংখ্যার বিশেষ প্রবন্ধে বিভিন্ন ধরনের যৌনসংক্রমিত রোগের কারণ এবং এ থেকে পরিত্রাণের উপায় সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে। ছবি দেখে রোগ নির্ণয় বিভাগে বরাবরের মতো এবারও কিছু নতুন রোগের ছবি সংযোজন করা হয়েছে, যা আপনাদের লব্ধ জ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধ করবে বলে আশা করছি।

জলাতঙ্ক একটি ভয়াবহ রোগ। কুকুর, বিড়াল ও অন্য পশুর কামড় বা আঁচড় থেকে এ রোগ হয়। প্রতিবছর জলাতঙ্ক রোগে বিশ্বে ৫৫ হাজার মানুষ মারা যায়, যার বেশির ভাগই শিশু। তাই কুকুরের কামড়ে কি করণীয় তা নিয়ে জরুরী চিকিৎসা বিভাগে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া পানিতে ডুবা রোগীদের ক্ষেত্রে করনীয় সম্পর্কেও এ বিভাগে আলোচনা করা হয়েছে। মাঝে মাঝে রোগ সম্পর্কিত নানা রকম প্রশ্ন আমাদের মনে উজ্জীবিত হয়, সেসব কিছু প্রশ্নের সঠিক সমাধান আমরা এই সংখ্যার রোগ ও জিজ্ঞাসা বিভাগে দেয়ার চেষ্টা করেছি।

রোগ ও চিকিৎসা বিভাগে গর্ভকালীন বিভিন্ন সমস্যায় প্রাথমিকভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ রোগ নিয়ে এই বিভাগে আলোচনা করা হয়েছে যা প্রতিনিয়ত আপনাদের মুখোমুখি হতে হয়।

রেফারেল ও ব্যবস্থাপত্র লিখন চিকিৎসা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই এই সংখ্যায় এ নিয়ে আপনাদেরকে কিছুটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

সর্বশেষে এই সংখ্যাটির তথ্যগুলো আপনাদের দৈনন্দিন চিকিৎসা প্রদানে সহায়তা করবে বলে আমরা আশা করছি।

ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছান্তে,

(ডাঃ এস. এম. সাইদুর রহমান)
মেডিকেল সার্ভিসেস্ ম্যানেজার

যৌনসংক্রমিত রোগ

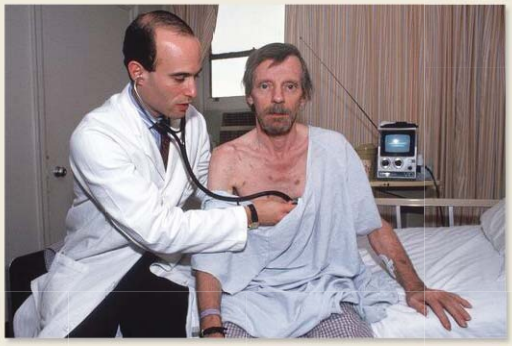

যে সকল রোগ-ব্যাধি যৌন মিলনের মাধ্যমে অর্থাৎ যৌন পথে একজনের কাছ থেকে অন্যজনের মধ্যে সংক্রমিত হয় তাকেই যৌনবাহিত রোগ বলা হয়। বিভিন্ন অনুজীব যেমন- ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ফাংগাস, প্রটোজোয়া ইত্যাদি যৌনবাহিত রোগের জন্য দায়ী। গত কয়েক দশক ধরে যে সকল যৌনবাহিত রোগ আমাদের সমাজে ভয়ঙ্করভাবে বিস্তার লাভ করেছে তাদের মধ্যে এইডস, সিফিলিস ও গনোরিয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধারণা করা হয় প্রতি বছর গড়ে ৫০ মিলিয়ন রোগী নতুন করে সিফিলিসে এবং ২৫০ মিলিয়ন রোগী গনোরিয়ায় আক্রান্ত হয়। বৃটেনে প্রতি বছর ০.৫ মিলিয়ন নতুন যৌন রোগী শনাক্ত করা হয়। সেখানে আগের তুলনায় গনোরিয়া এবং সিফিলিসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা শতকরা ৬ ভাগ বেড়ে গেছে। উন্নত দেশগুলোতে ক্ল্যালামাইডিয়া নামের এক প্রকার জীবাণু ঘটিত যৌন রোগীর সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইংল্যান্ডে নতুন সনাক্ত যৌন রোগীদের শতকরা ৪০ জন এই ক্ল্যালামাইডিয়া আক্রান্ত। পেনিসিলিনসহ অন্যান্য এন্টিবায়োটিক আবিস্কৃত হবার পর এই রোগের জটিলতা কমে গেছে। কিন্তু অযৌক্তিকভাবে এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের জন্য রেজিস্ট্যান্ট জীবাণুর সংখ্যাও বেড়ে গেছে।

যৌনবাহিত রোগের ক্ষেত্রে মহিলাদের উপসর্গসমূহ

- মহিলাদের যোনি পথে প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত এমনকি পুঁজ বা দইয়ের মতো সাদা স্রাব যাওয়া।
- মহিলাদের যোনি পথে চুলকানি বা জ্বালাপোড়া হওয়া।
- সহবাসের সময় ব্যথা হওয়া।
- যৌনাঙ্গে ঘা বা ক্ষত হওয়া।

যৌনবাহিত রোগের ক্ষেত্রে পুরুষদের উপসর্গসমূহ

- পুরুষদের প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে পুঁজ যাওয়া।
- ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া।
- প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া এবং ব্যথা হওয়া।
- অন্ডকোষে ব্যথা হওয়া এবং ফুলে যাওয়া।
- কুচকির লাসিকাগ্রন্থি ফুলে যাওয়া এবং ব্যথা হওয়া।
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে জ্বরও হওয়া।

যৌনবাহিত রোগের ক্ষেত্রে জটিলতাসমূহ

- অসময়ে প্রসব বা গর্ভপাত হতে পারে।
- ডিম্বনালীতে গর্ভধারণ হতে পারে যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।
- আক্রান্ত গর্ভবতী মা মৃত সন্তান প্রসব করতে পারেন।
- সন্তান ধারণে অক্ষমতা বা বন্ধ্যত্ব হতে পারে।
- পুরুষদের মূত্রনালী সরু হয়ে যেতে পারে এবং প্রস্রাবের বেগ বাধাগ্রস্ত হতে পারে।
- আক্রান্ত মায়ের নবজাতক শিশুর জন্মগত ত্রুটি ও অন্ধত্ব হতে পারে।
- মহিলাদের জরায়ুর মুখে ক্যান্সার হতে পারে।
- যৌনবাহিত রোগে আক্রান্ত হলে রোগীকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হতে হয়।
- স্বামী বা স্ত্রীর যে কেউ যৌনবাহিত রোগে আক্রান্ত হলে অপরজনের মধ্যে তা বিস্তারের সম্ভাবনা শতভাগ।

সিফিলিস

সিফিলিস একটি মারাত্মক যৌনরোগ। ট্রিপোনিমা প্যালিডাম *(Treponema pallidum)* নামক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এই যৌনবাহিত রোগটি সংক্রমিত হয়। এর ফলে অন্ধত্ব, প্যারালাইসিস এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। অধিকাংশ সময় সিফিলিস পুরুষের লিঙ্গ থেকে নারীর যোনিতে অথবা নারীর যোনি থেকে পুরুষের লিঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। সিফিলিসের চিকিৎসা খুব একটি জটিল নয়। অনেক সময় উপসর্গহীন সিফিলিস হতে পারে। পেনিসিলিন ইনজেকশন বা অন্যান্য এন্টিবায়োটিক হলো এর প্রধান চিকিৎসা।

সিফিলিসের উপসর্গসমূহ

প্রথম পর্যায়ের সিফিলিস

- ১০ থেকে ৮০ দিনের মধ্যে শরীরের র‍্যাশ দেখা যাওয়া।
- পায়ুর কাছে র‍্যাশ দেখা যাওয়া।
- স্তনবৃন্তে র‍্যাশ উঠা।
- ৪ থেকে ১০ সপ্তাহের মধ্যে অন্যান্য যৌন সমস্যার প্রকাশ পাওয়া।

দ্বিতীয় পর্যায়ের সিফিলিস

এই পর্যায়ে উপসর্গগুলো ৬ সপ্তাহের সময় থেকে অন্তত ৩ মাসের মধ্যে প্রকাশ পায়। এর উল্লেখযোগ্য উপসর্গগুলো হলো-

- চুল পড়ে যাওয়া, প্রচন্ড মাথাব্যথা।
- গলা শুকিয়ে যাওয়া।
- জ্বর হওয়া।
- শরীর সামান্য শুকিয়ে যাওয়া।

চূড়ান্ত পর্যায়ের সিফিলিস

সিফিলিসের সবচেয়ে মারাত্মক পর্যায় হলো এই স্তর। এই সময়ে উপসর্গগুলো হলো-

- হৃদপিণ্ড আক্রান্ত হওয়া।
- রক্তনালীর সমস্যা দেখা দেওয়া।
- মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ হওয়া।
- স্পাইনাল কর্ডের সমস্যা দেখা দেওয়া।
- স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হওয়া।
- চোখ আক্রান্ত হওয়া।
- যৌনাঙ্গের চূড়ান্ত সমস্যা দেখা দেওয়া।

চিকিৎসা

পেনিসিলিন ইনজেকশন সিফিলিসের প্রধান চিকিৎসা। এটি প্রতি সপ্তাহে একবার করে নিতম্বে দিতে হয়। ইনজেকশন নেবার আগে খেয়াল রাখতে হবে সিরিঞ্জ যেন জীবাণুমুক্ত হয়। যদি রোগীর পেনিসিলিনের স্পর্শকাতরতা থাকে তবে টেট্রাসাইক্লিন এবং এমপিসিলিন ৫০০ মিঃ গ্রাঃ করে দিনে ৪ বার করে ৭ দিন সেবন করতে দিতে হবে।

সিফিলিস যেভাবে ছড়ায়

- অবৈধ ও অনিরাপদ যৌন মিলনের মাধ্যমে।
- অপরীক্ষিত রক্ত গ্রহণের মাধ্যমে।
- ব্যবহৃত ইনজেকশনের সুচ বা সিরিঞ্জ ব্যবহার করলে।
- সিফিলিস আক্রান্ত মা হতে গর্ভস্থ সন্তানও আক্রান্ত হতে পারে।
- চামড়ার ক্ষত থেকেও সিফিলিস ছড়াতে পারে।

গনোরিয়া

এটি একটি যৌন বাহিত রোগ। সারা বিশ্বে বছরে প্রায় দুইশ মিলিয়ন গনোরিয়া রোগী পাওয়া যায়। নারীদের জন্য কোনো কোনো সময় এটি খুব মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। নাইসেরিয়া গনোরি *(Neisseria gonorrhoeae)* ব্যাকটেরিয়া আক্রমণে এই রোগ হয়ে থাকে। সাধারণত এটি শরীরের স্পর্শে বিশেষ করে যৌনাঙ্গের স্পর্শে অন্যকে সংক্রমিত করে। ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী নারীদের গনোরিয়া হবার সম্ভাবনা থাকে সবচেয়ে বেশি।

উপসর্গসমূহ

- লাল অথবা হলুদ বর্ণের র‍্যাশ দেখা যাওয়া।
- মূত্র ত্যাগের অসুবিধা হওয়া।
- যোনি বড় হয়ে ফুলে যাওয়া।
- সামান্য জ্বর হওয়া।
- তলপেটে চিন চিন ব্যথা হওয়া।
- মুখে আলসার হওয়া।
- পায়ু পথে ইনফেকশন হওয়া।

চিকিৎসা

গনোরিয়ার চিকিৎসা প্রধানত পেনিসিলিন দ্বারা হয়ে থাকে। যদি রোগীর পেনিসিলিন সংক্রান্ত সমস্যা থাকে, তবে রোগীকে নিম্নোক্ত ওষুধগুলো দিতে হবে। যেমন-

- ক্যাপসুল এমপিসিলিন ৫০০ মিঃ গ্রাঃ দিনে ৪ বার করে ৭ দিন দিতে হবে।
- ইনজেকশন জেন্টামাইসিন ৮০ মিঃ গ্রাঃ দিনে ২ বার করে ৩ দিন দিতে হবে।

গনোরিয়া যেভাবে ছড়ায়

- অবৈধ ও অনিরাপদ যৌন মিলনের মাধ্যমে।
- অপরীক্ষিত রক্ত গ্রহণের মাধ্যমে।
- ব্যবহৃত ইনজেকশনের সুচ বা সিরিঞ্জ ব্যবহার করলে।
- চামড়ার ক্ষতস্থান থেকে নির্গত রস ও পুঁজ থেকেও গনোরিয়া ছড়াতে পারে।

এইচআইভি ও এইডস

এইচআইভি (HIV) হচ্ছে বিশেষ এক ধরনের ভাইরাস। এই ভাইরাস মানবদেহে রোগ প্রতিরোধকারী কোষসমূহকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করে ফেলে। ফলে মানুষ তার শরীরের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে এক পর্যায়ে মারা যায়। আর এইচআইভি ভাইরাস সংক্রমণের পরিণতি এইডস (AIDS)। বিভিন্ন জীবাণুর হাত থেকে শরীরকে রক্ষা করার জন্য মানুষের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে। সেই ক্ষমতা শরীরে প্রহরীর ভূমিকা পালন করে শরীরকে নানাবিধ রোগ-ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা করে। এইচআইভি মানুষের শরীরে প্রবেশ করে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে মারাত্মকভাবে ধ্বংস করে দেয়। তখন শরীর প্রতিরোধমূলক কোনো ব্যবস্থা নিতে পারে না। ফলে একজন ব্যক্তি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং তার শরীরে নানা রকম রোগের লক্ষণ দেখা দেয়, এই অবস্থাকেই এইডস বলা হয়।

এইচআইভি আক্রান্ত হওয়ার পর বহু বছর পর্যন্ত মানুষের শরীরে এর লক্ষণগুলো প্রকাশ নাও পেতে পারে। সাধারণত এইচআইভি সংক্রমণের পর বিভিন্ন প্রকার রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে ৭ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। তবে অনেক ক্ষেত্রে এই সময়ের ব্যবধান ৫ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত হতে পারে।

উপসর্গসমূহ

- জ্বর হওয়া।
- লসিকা গ্রন্থি ফুলে যাওয়া।
- সর্দি - কাশি হতে পারে।
- র‍্যাশ দেখা যাওয়া।
- শারীরিক দুর্বলতা অনুভূত হওয়া।
- মাথা ব্যথা হওয়া।

যেভাবে এইচআইভি সংক্রমিত হতে পারে

- অনিরাপদ যৌন মিলন এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ায়।
- অবৈধ যৌন মিলনের মাধ্যমে।
- অপরীক্ষিত রক্ত গ্রহণের মাধ্যমে।
- ব্যবহৃত ইনজেকশনের সুচ বা সিরিঞ্জ ব্যবহার করলে।
- এইচআইভি আক্রান্ত মা হতে গর্ভাবস্থায়, প্রসবের সময় অথবা বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানোর মাধ্যমে সন্তানও এইচআইভি আক্রান্ত হতে পারে।

এইডস থেকে নিরাপদ থাকার উপায়

- পুরোপুরি ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা।
- স্বামী বা স্ত্রী ছাড়া অন্য নারী বা পুরুষের সঙ্গে যৌন মিলন থেকে বিরত থাকা।
- রক্ত গ্রহণের পূর্বে রক্তদাতার রক্তে এইচআইভি আছে কিনা তা পরীক্ষা করে নেয়া।
- প্রতি ক্ষেত্রে ইনজেকশন নেয়ার সময় নতুন সুচ ও সিরিঞ্জ ব্যবহার করা।
- এইচআইভি আক্রান্ত মায়েদের ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সন্তান ধারণে সিদ্ধান্ত নেয়া।
- বয়স, শারীরিক ও আবেগগত বিকাশ এবং আর্থিক নির্ভরতাসহ নানাবিধ কারণে যুব সমাজ এইচআইভি প্রতিরোধ ও এইডস সংক্রান্ত তথ্য, সেবা ও চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত।
- বিশ্বব্যাপী আর্থ-সামাজিক বৈষম্য, ধর্মীয় অনুশাসন উপেক্ষাজনিত কারণ কিশোর-কিশোরী এবং তরুণ-তরুণীদের এইচআইভি ও এইডস আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে।

বাংলাদেশে এইচআইভি ও এইডস পরিস্থিতি

সার্বিকভাবে বাংলাদেশে এইচআইভি সংক্রমণের হার যদিও কম, কিন্তু এ সংক্রমণের জন্য দায়ী সকল ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ আমাদের সমাজে বিদ্যমান। তাই এ দেশে যে কোনো সময় এইচআইভি ও এইডস মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা প্রবল। আমাদের যুবসমাজ, অর্থাৎ দেশের মোট জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ এইডসের ভয়াবহতার শিকার হতে পারে। বাংলাদেশে প্রথম এইচআইভি সংক্রমতি ব্যক্তি শনাক্ত করা হয় ১৯৮৯ সালে। সেই থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে শনাক্তকৃত এইচআইভি আক্রান্তের সর্বমোট সংখ্যা ২ হাজার ৫১২। এদের মধ্যে ৭৪৫ জন এইডসে আক্রান্ত হয়েছে এবং মারা গেছে ৫১২ জন।

তথ্যসূত্রঃ www.ebanglahealth.com

ছবি দেখে রোগ নির্ণয়

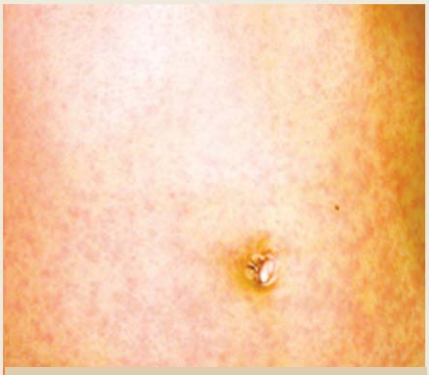

রুবেলা

সায়ালএডেনাইটিস

অস্টিওডিসট্রোফি

নিওনেটাল থাইরোটক্সিকোসিস

ভাইরাল কেরাটোকনজাংটিভাইটিস

ক্রিপ্টোকক্কসিস

কোল্ড এগ্লুটিনিন

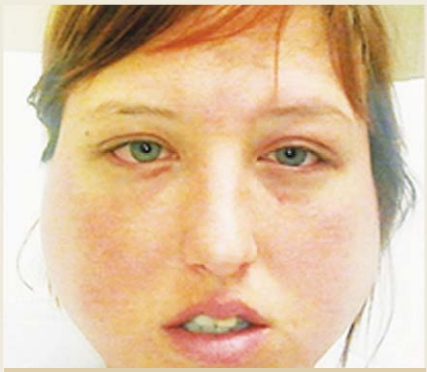

পেরোটিড ফিভার

আরটিকেরিয়া

পারপুরা

স্কোয়ামাস সেল কারসিনোমা

মেলানোমা

খাদ্যাভ্যাস ও শিশুর আচরণ

খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে বিভিন্ন রোগের সম্পর্ক বহু আগে থেকেই প্রমাণিত, এমনকি মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর খাদ্যের ভূমিকা প্রমানিত হয়েছে। সাম্প্রতিক কিছু গবেষণায় উঠে এসেছে এ নিয়ে কিছু অজানা তথ্য। অমনোযোগী অতিচঞ্চলতাজনিত সমস্যা বা অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপার-অ্যাকটিভিটি ডিসঅর্ডার (ADHD) তেমনি একটি সমস্যা।

ADHD নামের এই সমস্যায় আক্রান্ত শিশুরা সাধারণত দীর্ঘক্ষণ মনোযোগ দিতে হবে, এমন কাজ অপছন্দ করে এবং এড়িয়ে চলে। কোনো কাজ করতে দিলে ভুলে যায়। পড়াশোনা বা অন্যান্য কাজে ছোটখাটো ভুল করে প্রায় সব সময়। প্রায়ই পেনসিল, বই, খেলনা হারিয়ে ফেলে। অতিচঞ্চল শিশু কোথাও স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না, সব সময় ছোটাছুটি বা অস্থিরতার ভেতর থাকে। কথাও বেশি বলে।

গবেষকেরা বলছেন, কৃত্রিম রং বা গন্ধযুক্ত খাবার বেশি খেলে শিশু-কিশোরদের অতিচঞ্চলতা দেখা দিতে পারে। এই খাবারগুলো মস্তিষ্কের মনোযোগ নিয়ন্ত্রক অংশের রাসায়নিক ভারসাম্য বিনষ্ট করে।

যেসব শিশু শৈশবে অস্বাস্থ্যকর খাবার বেশি খায় এবং স্বাস্থ্যকর খাবার থেকে বঞ্চিত হয়, পরবর্তী সময়ে তাদের উদ্বেগ, বিষণ্নতাসহ নানা আবেগজনিত ও আচরণগত সমস্যা দেখা দেয়। প্রক্রিয়াজাত মাংস ও শস্য, কোমল পানীয়, অতিরিক্ত লবণযুক্ত খাবারকে অস্বাস্থ্যকর হিসেবে গণ্য করা হয়। অন্যদিকে শাকসবজি, ফলমূল, আঁশযুক্ত খাবার প্রভৃতি শিশুদের মানসিকতার জন্যও স্বাস্থ্যকর।

হৃদরোগের চিকিৎসায় চিলেশন থেরাপি

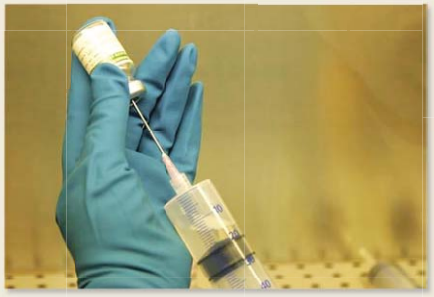

হৃদরোগ হিসেবে অ্যানজিনা পেকটোরিস সংক্ষেপে ‘বুকব্যথা’ হিসেবে পরিচিত। হৃদযন্ত্রের ধমনিতে ব্লকেজ থাকলে রক্ত চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয় বলে বুকে এই ব্যথা অনুভূত হয়। করোনারি আর্টারি বাইপাস সার্জারি বা গ্রাফটিং হলো সেই পদ্ধতি, যার মাধ্যমে রোগীর পায়ের শিরা কেটে নিয়ে হার্টের ব্লক হয়ে যাওয়া ধমনির বিকল্প পথ তৈরি করে দেওয়া হয়, যাতে হৃৎপিণ্ডের ধমনিতে রক্ত চলাচল অব্যাহত থাকে। হৃদরোগ চিকিৎসায় বেলুনিং বা এনজিওপ্লাস্টি বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। বাইপাস বা এনজিওপ্লাস্টি ছাড়াও ভিন্ন উপায় আছে, যা অত্যন্ত নিরাপদ ও স্বল্পব্যয়ী। এর নাম চিলেশন থেরাপি। একবার এই থেরাপিতে অভ্যস্ত হওয়ার পর বহু হৃদরোগীই আর অপারেশনে সম্মতি দেন না। একারনে হৃদরোগ প্রতিরোধের জন্য চিলেশন থেরাপিকে অনেকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। যারা একবার অপারেশন করিয়েছেন তাদের যেন দ্বিতীয়বার অপারেশন করতে না হয়, সে কারণেও এই থেরাপির কথা জোরালোভাবে বলা হয়।

চিলেশন থেরাপি বিনা অপারেশনের একটি চিকিৎসা পদ্ধতি, যা মেটাবলিকের উন্নতি ঘটায় এবং নানাভাবে রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়াকে গতিশীল রাখে। একই সঙ্গে দেহে ধাতব আয়নে সামঞ্জস্য নিয়ে আসে, ক্ষতিকর পদার্থ বের করে দেয়। এই থেরাপির জন্য হাসপাতালে ভর্তি হওয়া লাগে না, ডাক্তারের চেম্বারেই গ্রহণ করা সম্ভব। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যেসব রোগী হৃদরোগের বিকল্প চিকিৎসা হিসেবে এই চিলেশন থেরাপি গ্রহণ করেছে, তাদের সাফল্যের হার খুবই সন্তোষজনক। এই থেরাপি লাখ লাখ মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে, যারা বয়সজনিত বিভিন্ন ব্যাধিতে ভুগছিলেন। বিজ্ঞানীরা একপর্যায়ে এই থেরাপির ফলে ভিটামিন সি ও ই, সেলেনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, জিঙ্ক, বেটা ক্যারোটিনসহ অন্যান্য উপাদানের সংযুক্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হলেন, তখন এসবের বায়োলজিক্যাল অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান বিষয়ে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করলেন। আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই থেরাপি কেবল হৃদযন্ত্রের আশপাশের ধমনির জন্যই কার্যকর ভূমিকা রাখে না, দেহের অন্যান্য অংশের ধমনি, এমনকি হাত-পায়ের আঙ্গুল ও মস্তিষ্কের ধমনির জন্যও উপকার বয়ে আনে। প্রতিবছর ৬০ হাজারের মতো মানুষ তাদের পা হারায় গ্যাংগ্রিনে, ধমনিতে ব্লকেজ সৃষ্টি হয়ে। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে মারা যায় বহু লোক। এর প্রতিটি ক্ষেত্রে ঝুঁকিহীনভাবে চিকিৎসায় চিলেশন থেরাপি অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

তথ্যসূত্রঃ www.sasthabangla.com

কুকুরের কামড়

কুকুরের কামড় অবহেলা করা ঠিক নয়। কুকুর, বিড়াল বা যে কোন গৃহপালিত পশুর দেহেই জলাতঙ্ক বা র‍্যাবিসের জীবাণু থাকতে পারে। জলাতঙ্ক রোগটি খুবই ভয়াবহ। কুকুর, বিড়াল ও অন্য পশুর কামড় বা আঁচড় থেকে এ রোগ হয়। তবে এ প্রাণিগুলির কোনটিই জীবাণুটির শুধুমাত্র ক্যারিয়ার বা বাহক নয়, এদের শরীরে জীবাণুটি ঢুকলে প্রাণিগুলিও আক্রান্ত হয় এবং মারা যায়। প্রতিবছর জলাতঙ্ক রোগে বিশ্বে ৫৫ হাজার মানুষ মারা যায়, যার বেশির ভাগই শিশু। জলাতঙ্ক হয় র‍্যাবিস ভাইরাসের মাধ্যমে। এ ভাইরাস মস্তিষ্কের স্টেমের নিউক্লিয়াস এমবিগুয়েসকে আক্রমণ করে। মস্তিষ্কের এ অংশটি প্রশ্বাসে নিয়োজিত শরীরের বিভিন্ন অংশকে অতিরিক্ত উত্তেজনা থেকে দমন করে রাখে এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের সমন্বয় ঘটায়। কিন্তু ভাইরাস সংক্রমণে এই কাজে ব্যাঘাত ঘটে। ফলে জলাতঙ্ক রোগী যখন পানি খেতে যায়, তখন তার গলা ও শ্বাসনালি উত্তেজনায় সংকুচিত হয়ে তীব্র ব্যথার অনুভূতি জাগায়। সেই সঙ্গে কিছু পানি শ্বাসনালি দিয়ে মূল শ্বসনতন্ত্রে ঢুকে অনবরত কাশি হয়ে এক ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ফলে পানি দেখলেই এসব রোগী ভয় পায়। তাই এ রোগের নাম জলাতঙ্ক। উল্লিখিত লক্ষণ ছাড়াও এ রোগে অসংলগ্ন আচরণ, আবোলতাবোল কথাবার্তা, দৈনন্দিন কাজ করতে না পারা, অতিরিক্ত উত্তেজনা, শ্বাসকষ্ট এমনকি শ্বসনতন্ত্র অকেজোও হয়ে যেতে পারে। একবার এ রোগের লক্ষণ দেখা দিলে তা মারাত্মক আকার ধারণ করে, যা মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। তাই এ রোগ প্রতিরোধে পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। ১৮৮৫ সালে লুই পাস্তুর এ রোগের টিকা আবিষ্কার করেন। কিন্তু এরপরেও এ রোগ নিয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা কম।

কুকুরে কামড়ালে করণীয়

- আক্রান্ত ব্যক্তির ভীতি দূর করতে হবে।
- কুকুর কামড়ালে ক্ষতস্থান সাবান পানি দিয়ে অন্তত ১০ মিনিট ধরে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে। এরপর দিতে হবে পভিডন আয়োডিন।
- কোন ভাঙ্গা দাঁত বা অন্য কোন অংশ ভিতরে আছে কি না পরীক্ষা করে দেখতে হবে।
- জলাতঙ্ক রোগ হতে পারে এমন কুকুর বা অন্য পশু কামড় বা আঁচড় দিলে সঙ্গে সঙ্গে টিকা নেওয়া উচিত। ০, ৩, ৭, ১৪ ও ২৮তম দিনে হাতের মাংসপেশিতে টিকা দিতে হয়। আগে বলা হতো, কোনো কুকুর কামড়ালে সেই কুকুরকে ১০ দিন পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং ১০ দিনের মধ্যে কুকুরটি মারা না গেলে টিকা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এখন সে ধারণা সত্য নয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। গবেষনায় দেখা গেছে, জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে দায়ী কুকুরগুলো দীর্ঘদিন জীবিত ছিল। তাছাড়া সম্পূর্ণ সুস্থ কুকুরও জলাতঙ্কের জীবাণু বয়ে বেড়াতে পারে। সম্পূর্ণ সুস্থ কয়েকটি কুকুরের মস্তিষ্ক পরীক্ষা করে দেখা গেছে, প্রতিটির মধ্যে নেগরি-বডি রয়েছে, যা ভাইরাসের উপস্থিতি প্রমাণ করে। সুতরাং বাইরে থেকে আপাত সুস্থ দেখতে কুকুরের মধ্যেও জলাতঙ্কের জীবাণু থাকতে পারে। তাই কুকুরে কামড়ালে দেরি না করে টিকা নেওয়া উচিত।
- এর সঙ্গে দিতে হবে ইমিউনোগ্লোবিওলিন ইনজেকশন। এই ইমিউনোগ্লোবিওলিন ইনজেকশন অবশ্য বেশ ব্যয়বহুল ও অপ্রতুল।

কুকুরে কামড়ালে যে বিষয়গুলির ব্যাপারে সাবধান থাকা জরুরি

- কখনোই ক্ষতস্থান কেটে দেওয়া বা শুষে নেওয়া ইত্যাদি করা যাবে না, এতে ইনফেকশন হতে পারে।
- কখনোই ক্ষতস্থানে বরফ লাগানো যাবে না, এতে ফ্রস্ট বাইট হতে পারে।
- ক্ষতস্থান ব্যান্ডেজ, কাপড় বা অন্য কিছু দিয়ে কখনো ঢাকা যাবে না।
- কখনোই ক্ষতস্থানে তাগা বা ডোরা (Tourniquet) বাঁধা যাবে না, যেটি সাপে কামড়ালে বাঁধতে হয়।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা

- যেসব প্রাণীর আঁচড় বা কামড়ে জলাতঙ্ক হয়, যেমন-কুকুর, বিড়াল, শেয়াল প্রভৃতি থেকে সাবধান থাকা এবং তাদের সংস্পর্শে না আসা। বিশেষ করে বাচ্চাদের দূরে রাখা।
- গৃহপালিত কুকুর-বিড়ালকে নিয়মিত টিকা দেওয়া।
- কুকুরে না কামড়ালেও আগে থেকে টিকা দেওয়া যায়। ০, ৭, ২১ অথবা ২৮তম দিনে তিন থেকে চারটি টিকা দিতে হবে। টিকা দেওয়ার প্রথম দিনকে ধরতে হবে। সবাই এ টিকা নিতে পারে।

তথ্যসূত্রঃ www.indg.in

পানিতে ডুবা

পানিতে ডুবার প্রাথমিক চিকিৎসা

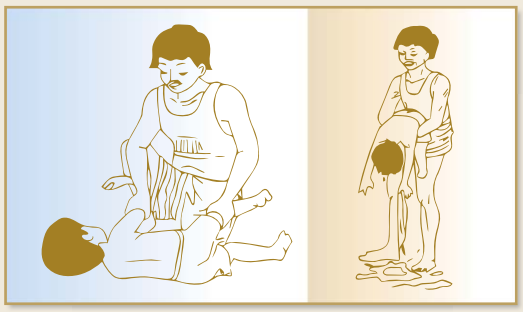

আক্রান্ত ব্যক্তির বয়স ও ওজন কম হলে -

- আক্রান্ত ব্যক্তিকে চিত করে শুইয়ে দিতে হবে।
- এক হাত ও এক পা ধরে আক্রান্ত ব্যক্তিকে উপুর করে দিতে হবে।
- দুই হাত দিয়ে পেট ধরে টেনে তুলতে হবে।
- এভাবে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ধরে রাখতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার মুখ দিয়ে পানি বের হয়ে আসে।
- মুখ দিয়ে পানি বের হওয়া বন্ধ হয়ে গেলে তাকে শুইয়ে দিতে হবে।

আক্রান্ত ব্যক্তির বয়স ও ওজন বেশি হলে -

- চিত করে শুইয়ে দিয়ে মুখ একদিকে কাত করে দিতে হবে।
- আক্রান্ত ব্যক্তির দুই পা সাহায্যকারীর দুই পায়ের মাঝখানে রাখতে হবে।
- আক্রান্ত ব্যক্তির নাভি আর পাঁজরের মাঝখানে সাহায্যকারীর হাতের গোড়াটি রেখে আকস্মিকভাবে জোরে উপর দিকে চাপ দিতে হবে। পানি বের না হওয়া পর্যন্ত এভাবে চাপ দিতে হবে।
- দ্রুত নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে।

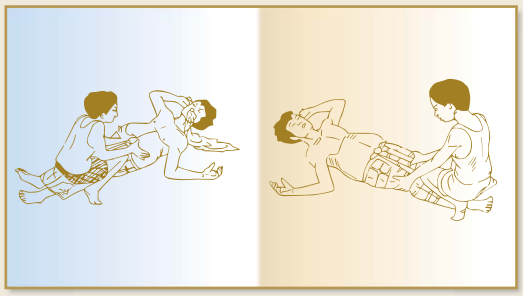

তথ্যসূত্রঃ icddr,b

স্বাস্থ্য টিপস্

কলার উপকারিতা!

- ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রনে রাখতে
- হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে
- হাড়ের মজবুত গঠনে
- রক্ত শূন্যতা প্রতিরোধে
- আলসার প্রতিরোধে
- দুশ্চিন্তা কমাতে
- মস্তিষ্ক গঠনে

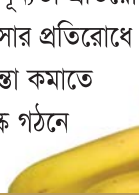

প্রতিদিন তুলশি পাতা = কোন ক্যানসার নয়

প্রতিদিন একটি লেবু = কোন অতিরিক্ত চর্বি নয়

প্রতিদিন এক কাপ দুধ = কোন হাড় জনিত সমস্যা নয়

প্রতিদিন ৩ লিটার পানি = কোন রোগ নয়

রোগ ও জিজ্ঞাসা

হঠাৎ অস্থিরতা ও খারাপ লাগা বড় কোনো রোগের লক্ষণ?

উত্তরঃ নানা কারণেই কারও হঠাৎ অস্থিরতা ও খারাপ লাগতে পারে। তবে রক্তে শর্করা স্বল্পতা ও নীরব হার্ট অ্যাটাক এই দুটো কারণ হলো সবচেয়ে মারাত্মক। ডায়াবেটিস রোগীদের, যাঁরা ওষুধ বা ইনসুলিন ব্যবহার করেন, তাঁদের রক্তে শর্করা স্বল্পতা হলে অস্থির লাগে, বুক ধড়ফড় করে, ঘাম হয়, হাত-পা কাঁপে। তৎক্ষণাৎ চিনি বা মিষ্টি খেলে তা ভালো হয়ে যায়। আবার নীরব হার্ট অ্যাটাকেও এই ধরনের উপসর্গ থাকতে পারে। এ ধরনের উপসর্গে জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন।

গর্ভাবস্থায় এক্স-রে করা নিষেধ কেন?

উত্তরঃ বিশেষ করে প্রথম তিন মাসে যখন গর্ভস্থ ভ্রূণের কোষ বিভাজিত হতে থাকে ও নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তৈরি হতে থাকে, তখন এক্স-রে সহ যেকোনো ধরনের তেজস্ক্রিয়া ব্যবহার করা নিষেধ। কেননা তেজস্ক্রিয় পদার্থ কোষ বিভাজনকে অস্বাভাবিক করে বিকলাঙ্গতা করতে পারে। তাই যেকোনো ধরনের তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহার থেকে বিরত থাকাই উত্তম।

মৃগীরোগ কি একটি মানসিক রোগ?

উত্তরঃ মৃগীরোগ মানসিক রোগ নয়। মৃগীরোগ হচ্ছে স্নায়ুতন্ত্রের একটি রোগ। মস্তিষ্কের অতি সংবেদনশীলতা ছাড়াও এ রোগে নানা কারণে খিঁচুনি হতে পারে। যেমনঃ মস্তিষ্কে টিউমার, স্ট্রোক, মাথায় আঘাত ও রক্তপাত, রক্তশিরায় সমস্যা, সংক্রমণ, মাত্রাতিরিক্ত জ্বর, মানসিক প্রতিবন্ধকতা, আলঝেইমার, বিভিন্ন ওষুধ, শরীরের লবণ, ভিটামিন বা খনিজ পদার্থের ভারসাম্যহীনতা এবং ডায়াবেটিসের রোগীর রক্তের শর্করার আধিক্য বা স্বল্পতা থেকেও মৃগীরোগ দেখা দিতে পারে।

ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট দীর্ঘদিন খেলে কি কিডনিতে পাথর হতে পারে?

উত্তরঃ অনেক দিন ধরে একটানা ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট সেবন করলে কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি ২০ শতাংশ বেড়ে যায়। প্রথমত, সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন ছাড়া ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট খাবেন না। দ্বিতীয়ত, ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট খাবারের সঙ্গে খাবেন। বিশেষ করে অক্সালেটযুক্ত খাবার (যেমনঃ মাংস, আঙুর, বাদাম ও শাকসবজি) কিডনিতে পাথর তৈরি হওয়ার ঝুঁকি কমাবে। তৃতীয়ত, প্রচুর পানি পান করুন। চতুর্থত, খাদ্যতালিকা থেকে যথাসম্ভব ক্যালসিয়াম খাওয়ার চেষ্টা করুন, ট্যাবলেট থেকে নয়।

শিশুদের দুধ খাওয়ানোর পর হিক্কা উঠলে কী করা উচিত?

উত্তরঃ শিশুদের দুধ খাওয়ার পর প্রায়ই হিক্কা ওঠে। এতে ভয়ের কিছু নেই। সাধারণত গ্যাস ও তরল একসঙ্গে ওপরে উঠতে চেষ্টা করে বলেই এমন ঘটে। শিশুদের খাওয়ানোর পর সোজা করে ঘাড়ের ওপর নিয়ে পিঠে মৃদু চাপ দিয়ে গ্যাসটি বের করে দিতে হবে। খাওয়ানোর পর সঙ্গে সঙ্গে না শুইয়ে কিছুক্ষণ কোলে বা ঘাড়ে সোজা করে রাখলে অনেক সময় গ্যাস বের হয়ে যায়। পেট খালি হয়ে গেলেই তরল দুধ নিচে নেমে আসবে এবং হিক্কা থেমে যাবে। খাওয়ানোর পর এই নিয়মে শিশুকে নিয়মিত ঢেকুর ওঠানো উচিত।

জন্ডিসের রোগীরা কি সব ধরনের খাবার খেতে পারবে?

উত্তরঃ জন্ডিসের রোগীদের খাবারের ব্যাপারে তেমন কোনো বিধিনিষেধ নেই। তবে ভাইরাল হেপাটাইটিসে যকৃতের কার্যকারিতা কিছুটা হলেও ব্যাহত হয়। তাই যেসব খাবার হজম করতে পিত্তরসের প্রয়োজন হয়, সেগুলো এড়িয়ে চলাই উচিত। যেমনঃ চর্বিজাতীয় খাবার (ঘি, মাখন, যেকোনো ভাজা খাবার, গরু ও খাসির মাংস ইত্যাদি)। এতে যকৃৎ ও পিত্তথলির ওপর অতিরিক্ত কাজের চাপ সৃষ্টি হবে। জন্ডিসের রোগীদের ক্যালরির উৎস হিসেবে তাই সহজে হজমযোগ্য সরল শর্করা, যেমনঃ শরবত, ভাত, জাউভাত, সুজি, রুটি ইত্যাদি বেশি খাওয়া উচিত।

কিশোরী মেয়েদের মাসিকের সময় তলপেটে তীব্র ব্যথার নিরাময় কী?

উত্তরঃ অধিকাংশ কিশোরীই এই সমস্যা বা প্রাইমারি ডিসমেনোরিয়ায় ভুগে থাকে। প্রোস্টাগ্ল্যানডিন নিঃসরণের কারণে জরায়ুর রক্তনালি সংকোচন ও রক্তপ্রবাহ কমে যাওয়ার কারণে এটি হয়। কারও স্কুল-কলেজে যেতে বা স্বাভাবিক কাজকর্মেও সমস্যা দেখা দেয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যথার তীব্রতা কমে আসে এবং গর্ভধারণের পর ও স্বাভাবিক প্রসব হলে সাধারণত কমে যায়। তবে তীব্র ব্যথা হলে বিউটাপ্যান বা মেফেনামিক ওষুধ দেওয়া যেতে পারে।

তথ্যসূত্রঃ www.ebanglahealth.com

গর্ভকালীন সমস্যা

গর্ভের মোট সময় কাল ধরা হয় ৪০ সপ্তাহ বা ২৮০ দিন বা ৯ মাস ৭ দিন শেষ মাসিকের প্রথম দিনটিকে গর্ভধারনের প্রথম দিন ধরে প্রসবের তারিখ নির্ধারন করা হয়ে থাকে। যেমন - গর্ভধারণের শেষ মাসিকের প্রথম দিন যদি ২০ ডিসেম্বর হয় তবে প্রসবের সম্ভাব্য তারিখ হবে ২৭ সেপ্টেম্বর এ ক্ষেত্রে প্রতি মাসকে ৩০ দিন হিসেবে ধরা হয়। প্রসবের প্রস্তুতির জন্য এভাবে প্রসবের তারিখ নির্ণয় করা যায়। এই তারিখের ২ সপ্তাহ আগে বা পরে যে কোনও তারিখে সাধারণত প্রসব হয়ে থাকে।

প্রসব আরম্ভের লক্ষণ

প্রসব শুরু হওয়ার ৪টি লক্ষণ রয়েছেঃ

- প্রসব বেদনা ও সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুর সংকোচন।
- যোনীপথে রক্ত মিশ্রিত স্রাব বের হওয়া।
- জরায়ুর মুখ খুলে যাওয়া।
- পানিপূর্ণ থলি।

প্রসব বেদনা

একজন গর্ভবতীর প্রসব বেদনা ছাড়াও অন্যান্য অনেক কারণে পেটে ব্যথা হতে পারে। প্রসব বেদনা হলে ব্যথার সঙ্গে জরায়ুও সংকুচিত হবে। জরায়ুর সংকোচন হচ্ছে কিনা বোঝার উপায় হচ্ছে, যখন ব্যথা হয় ঠিক তখনই জরায়ুও সংকুচিত হয়। তখন পেটে হাত দিলে অনুভব করা যাবে যে জরায়ু শক্ত হয়ে আছে, আর ঠিক তার পরক্ষণেই যখন ব্যথা নেই অর্থাৎ জরায়ু স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে তখন পেটে চাপ দিলে হাতে অনুভব করা যাবে যে জরায়ু নরম হয়ে আছে। প্রসব বেদনার আরো একটি চরিত্র আছে এই ব্যথা একবার আসে আর চলে যায়, আবার আসে এটা বারবার হতে থাকে।

সময়ের সাথে বেদনার তীব্রতা তত বাড়তে থাকে এবং দুই ব্যথার মাঝখানে বিরতির সময়ও কমে আসতে থাকে। প্রসব বেদনা শুরু হয় পিঠের দিকে এবং ধীরে ধীরে তা সামনের (উরুর) দিকে এগিয়ে আসে।

যোনিপথে রক্ত মিশ্রিত স্রাব নির্গমণ

প্রসব বেদনা শুরু হলে যোনিপথ থেকে অল্প অল্প পরিমাণ রক্ত মিশ্রিত স্রাব বের হতে থাকে। একে চিকিৎসা পরিভাষায় শো বলে। গর্ভাবস্থায় জরায়ুর মুখ সাধারণত ঢাকা থাকে। ঢাকনাটি জরায়ুর মধ্যের শিশুটিকে সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে। এই ঢাকনাটি প্রসবের আগে খুলে বেরিয়ে আসে এবং তখনই এই রক্তস্রাব শুরু হয়।

জরায়ুর মুখ খুলতে থাকা

গর্ভকালে জরায়ু মুখ পুরোপুরি বন্ধ থাকে কিন্তু প্রসব বেদনা শুরু হলেই জরায়ুর মুখ ধীরে ধীরে খুলতে শুরু করে।

পানিপূর্ণ থলি

গর্ভস্থ শিশু একটি থলির মধ্যে থাকে। থলিটা একটি বিশেষ জলীয় পদার্থে ভর্তি থাকে। প্রসবকালে জরায়ুর মুখ খুলে গেলে গর্ভফুলের পর্দা কিছু পরিমাণ ঐ জলীয় পদার্থসহ জরায়ুর মুখ দিয়ে নিচের দিকে ঝুলে পড়ে। শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বে এই পানির থলি ভেঙে যায় এবং যোনিপথে পানির মতো জলীয় পদার্থ বের হয়ে আসে।

স্বাভাবিক প্রসব প্রক্রিয়া

স্বাভাবিক প্রসব প্রক্রিয়ার তিনটি স্তর রয়েছে।

প্রথম স্তরঃ প্রসবের প্রথম স্তর হলো প্রসব বেদনা শুরু হওয়া থেকে জরায়ুর মুখ সম্পূর্ণ খুলে যাওয়া পর্যন্ত সময় বা অবস্থা। প্রথম সন্তানের ক্ষেত্রে প্রথম জরায়ুর মুখ খুলতে সময় লাগে ৮ থেকে ১২ ঘণ্টার মতো। দ্বিতীয় বা পরবর্তী সন্তানের ক্ষেত্রে ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা সময় লাগে।

দ্বিতীয় স্তরঃ জরায়ুর মুখ সম্পূর্ণভাবে খোলা থেকে শিশু সম্পূর্ণ ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত সময় বা অবস্থা। এই সময় পানির থলি ফেটে যায় এবং শিশু জরায়ু থেকে প্রসব পথে ভূমিষ্ট হয়। প্রসবের এই স্তর সম্পন্ন হতে ২ ঘণ্টার বেশি সময় লাগে না।

তৃতীয় স্তরঃ শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর গর্ভফুল বের হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সময় বা অবস্থা। সাধারণত ৫ মিনিট থেকে ৩০ মিনিটের মধ্যে গর্ভফুল বেরিয়ে আসে। গর্ভফুল বের হওয়ার পরে দেখা উচিত তা সম্পূর্ণরূপে বের হয়েছে কিনা। গর্ভফুলের কোনও অংশ ছিঁড়ে জরায়ুতে রয়ে গেলে, প্রসূতিকে নিকটতম স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে। প্রসবের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে অর্থাৎ প্রসব বেদনা শুরু হওয়া থেকে গর্ভফুল বের হওয়া পর্যন্ত প্রথম গর্ভবতীর জন্য সময় লাগে সর্বোচ্চ ২৪ ঘণ্টা এবং দ্বিতীয় বা তার পরের গর্ভবতীর সর্বোচ্চ ১২ ঘণ্টা সময় লাগে। এই সময়ের মধ্যে প্রসব সম্পন্ন না হলে গর্ভবতীকে দ্রুত নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে।

অস্বাভাবিক প্রসব

স্বাভাবিক প্রসবের ব্যতিক্রম যে কোন প্রসবকে অস্বাভাবিক প্রসব বলা যায়। গর্ভস্থ ভ্রূণের সংখ্যা, অস্বাভাবিক অবস্থান, অস্বাভাবিক প্রসবের কারণ। অস্বাভাবিক প্রসবের ব্যবস্থাপনা হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে করতে হবে। তাই রোগীকে যত দ্রুত সম্ভব স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। গর্ভস্থ শিশুর অবস্থান এবং প্রসবের সময় জরায়ুতে শিশুর অবস্থানের ওপর প্রসবের সুবিধা-অসুবিধা নির্ভর করে। শিশুর মাথাটি যদি নিচের দিকে অর্থাৎ জরায়ুর মুখে থাকে তাহলে তা স্বাভাবিক অবস্থা। কখনো কখনো আবার মাথা নিচের দিকে না থেকে শিশুর দেহের অন্য অংশও নিচের দিকে থাকতে পারে। এগুলোকে অস্বাভাবিক অবস্থান বলে এবং এগুলো অস্বাভাবিক প্রসবের কারণ। অস্বাভাবিক অবস্থা অনেক রকম হতে পারে-

- শিশুর পশ্চাৎ অংশ জরায়ুর মুখে ও মাথা ওপর দিকে থাকলে।
- শিশুটি জরায়ুতে আড়াআড়িভাবে থাকতে পারে।
- শিশুর মুখ নিচের দিকে থাকতে পারে।

দীর্ঘস্থায়ীপ্রসব

যদি কোন কারণে প্রথম গর্ভের ক্ষেত্রে প্রসবে ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় লাগে এবং দ্বিতীয় বা তার পরের গর্ভের ক্ষেত্রে ১২ ঘণ্টার বেশি সময় লাগে তবে তাকে দীর্ঘস্থায়ী প্রসব বলে। গর্ভে সন্তানের অবস্থান অস্বাভাবিক হলে, মস্তিষ্কের হাড়ের গঠন অস্বাভাবিক হলে, গর্ভবতীর মারাত্মক অপুষ্টি থাকলে প্রসব দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। এ অবস্থায় রোগীকে হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে। আমাদের দেশে গর্ভবতী মায়ের মৃত্যু, মৃত প্রসব ও শিশু মৃত্যুর একটি অন্যতম কারণ দীর্ঘস্থায়ী প্রসব। সময়মত রোগীকে হাসপাতালে বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র পাঠালে মা ও শিশুর মৃত্যুহার অনেকাংশে কমানো সম্ভব।

তথ্যসূত্রঃ www.sasthabangla.com

বাতজ্বর

বাতজ্বর (Rheumatic fever) একটি জীবাণু সংক্রমিত প্রবল সংক্রামক ব্যাধি যার কারণে জ্বরসহ দেহের বিভিন্ন সন্ধি ও পেশীসমূহের স্ফীতি ও বেদনা এবং হৃদপিণ্ডের রক্তপ্রবাহের বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয়। বাতজ্বর ৫ থেকে ১৫ বছরের শিশুদেরই বেশি হয়ে থাকে। বাতজ্বর থেকে পরে হৃদরোগ, হৃদযন্ত্রের ভালভ নষ্ট হওয়া ইত্যাদি সমস্যা হতে পারে বলে অনেকে রোগটি নিয়ে আতঙ্কে থাকেন। শিশুদের গিঁটে ব্যথা হলে অনেক সময় বাতজ্বর হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

মূখ্য উপসর্গসমূহ

- অস্থিসন্ধির প্রদাহজনিত ব্যথা ও ফুলে যাওয়া, যা একটি সন্ধি ভালো হয়ে গেলে অন্যটিকে আক্রমণ করে।
- হৃদপিণ্ডের প্রদাহ বা কার্ডাইটিস।
- ত্বকের নিচে গোটা, ত্বকের লালচে দাগ।
- স্নায়ুজটিলতায় পেশির অস্বাভাবিক চলন।

গৌণ উপসর্গ

- জ্বর হওয়া।
- সন্ধিতে ব্যথা।
- ইসিজিতে (ECG) বিশেষ পরিবর্তন।
- রক্তে ইএসআর (ESR) বা সিআরপি (CRP) বৃদ্ধি।

দুটি মুখ্য অথবা একটি মুখ্য উপসর্গের সঙ্গে দুটি গৌণ উপসর্গ মিলে গেলে এবং এর সঙ্গে স্ট্রেপটোকক্কাস ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ প্রমাণিত হলেই কেবল বাতজ্বর হয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়া যাবে। স্ট্রেপটোকক্কাস সংক্রমণ প্রমাণ করতে এএসও টাইটার (ASO titre) অথবা থ্রোট কালচার (Throat culture) করা হয়। তার মানে, এএসও টাইটার বাতজ্বরের প্রধানতম নির্দেশিক নয়, একটি সহায়ক মাত্র।

চিকিৎসা

- ব্যথা ও প্রদাহ কমানোর জন্য NSAID জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ কমানোর জন্য মাংসপেশীতে ইনজেকশন পেনিসিলিন অথবা ট্যাবলেট পেনিসিলিন সাত দিন দিতে হবে।
- রোগীকে পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলতে হবে।
- স্বাভাবিক পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার জন্য পরামর্শ দিতে হবে।

রোগ নির্ণয়কালীন সময়ের জরুরি বিষয়

- কেবল এএসও টাইটার বাড়লেই বাতজ্বর হয়েছে তা বলা যাবে না। আবার এ রিপোর্ট স্বাভাবিক, মানে বাতজ্বর নেই তা-ও বলা যায় না।
- স্ট্রেপটোকক্কাস ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে টনসিল বা গলার প্রদাহ হলে রক্তে এএসও টাইটার বাড়ে। যেকোনো টনসিল সংক্রমণেই এ পরীক্ষার রিপোর্ট অস্বাভাবিক আসতে পারে। তাই এটি বাতজ্বরের কোনো নিশ্চিত ও একমাত্র প্রমাণ নয়।
- বাতজ্বরে গলা, পিঠ, হাত ও পায়ের ছোট ছোট গিরা আক্রান্ত হয় না।
- ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে হৃদপিণ্ডে প্রদাহ হয় না।
- বাতজ্বর নির্ণয় করার পর এর জটিলতাসমূহ প্রতিরোধের জন্য একটি শিশুকে দীর্ঘদিন কিংবা বছরের পর বছর পেনিসিলিন ইনজেকশন বা বড়ি সেবন করতে হয়। তাই চিকিৎসা শুরু করার আগে রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নেওয়াই ভালো।

তথ্যসূত্রঃ www.ebanglahealth.com

থ্যালাসেমিয়াঃ রক্তের রোগ

থ্যালাসেমিয়া একটি জন্মগত রক্তের রোগ। মা-বাবার মধ্যে কেউ বা দুজনেই থ্যালাসেমিয়া রোগী বা এ রোগের বাহক হলে সন্তান এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। হিম ও গ্লোবিন প্রোটিন নিয়ে রক্তে লোহিত কণিকার অন্যতম উপাদান হিমোগ্লোবিন গঠিত। জিনগত ত্রুটির কারণে গ্লোবিন চেইনের গঠনে সমস্যা হলে এই রোগের সৃষ্টি হয়। এতে মারাত্মক রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়।

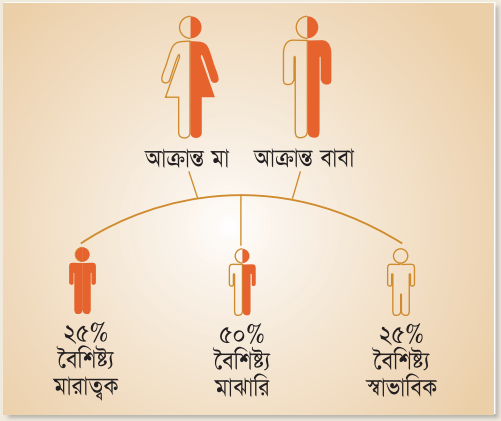

উপসর্গসমূহ

রোগের তীব্রতা অনুযায়ী লক্ষণে বিভিন্নতা দেখা দেয়। মারাত্মক থ্যালাসেমিয়াকে বলা হয় থ্যালাসেমিয়া মেজর-এতে শিশুর বয়স তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যেই নিম্নোক্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

- মারাত্মক রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়া।
- দুর্বল ও ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া।
- যকৃত ও প্লীহা বড় হয়ে পেটে চাকা অনুভূত হওয়া।

মাঝারি বা হালকা মাত্রার রোগ অর্থাৎ থ্যালাসেমিয়া মাইনরে আরও দেরিতে লক্ষণ প্রকাশ পায়।

- এতে রক্তস্বল্পতা তীব্র হয় না।
- দুর্বলতা, বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ পরিলক্ষিত হতে পারে।
- অনেক সময় মৃদু মাত্রার রোগ বাহকেরা বড় হওয়া পর্যন্ত জানতেই পারে না। তখন বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে তা ধরা পরে।

চিকিৎসা

মেজর থ্যালাসেমিয়ার রোগীকে নিয়মিত বিরতিতে রক্ত দিতে হয়। তা না হলে রোগীকে বাঁচানো দূরহ হয়ে পরে।

- এর সঙ্গে বারবার লোহিত কণিকা ভেঙে যাওয়ার কারণে এবং বারবার রক্ত দেওয়ার জন্য এদের শরীরে অতিরিক্ত আয়রন বা লৌহ জমে যায়। অতিরিক্ত আয়রন বিভিন্ন অঙ্গে বিশেষ করে গ্রন্থিগুলোতে জমে গেলে সেই গ্রন্থির কার্যকারিতা নষ্ট হয়।
- এজন্য আয়রনযুক্ত খাবার বা আয়রন বড়ি এড়িয়ে চলতে বলা হয়। প্রয়োজনে নিয়মিত রক্ত থেকে আয়রন নিষ্কাশন করার দরকার পড়ে। অনেক সময় প্লীহা কেটে ফেলে দিতে হয়।
- তবে অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন বা বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট হলো এর নিরাময়ে একমাত্র চিকিৎসা।

প্রতিরোধ

- মাইনর থ্যালাসেমিয়া বাহকদের অনেকেই এই সমস্যার উপস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। ফলে দুজন আক্রান্ত জিনের অধিকারী বা দুজন বাহকের মধ্যে বিয়ে হলে তাঁদের সন্তান মারাত্মক থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত হতে পারে।
- মৃদু মাত্রার রক্তস্বল্পতা হলেও অকারণে আয়রন বড়ি না খেয়ে রক্তস্বল্পতার কারণ খুঁজে দেখা দরকার।
- দম্পতির কেউ বাহক হলে গর্ভধারণের আগেই ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ।

তথ্যসূত্রঃ www.prothom-alo.com

এই গরমে ডায়রিয়া

গরম এলেই ডায়রিয়ার প্রকোপ বাড়ে। আর দুই বছরের নিচে শিশুদের ডায়রিয়ার প্রধান কারণ হলো, রোটা ভাইরাসজনিত সংক্রমণ। প্রচন্ড গরমে ঠান্ডা পানি বিশুদ্ধ বা দূষিত কি না, তা না ভেবে অনেকে পান করে ফেলে। এভাবে অনেকে পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

গরমে প্রচণ্ড পিপাসায় অনেকেই রাস্তাঘাটের শরবত, পানি, পানীয়, বিভিন্ন ফল ইত্যাদি পান বা খেয়ে থাকেন। কিন্তু রাস্তাঘাটের অধিকাংশ খাবার দূষিত থাকে, তাই গরমে এই দূষিত খাবার খেয়েই অনেকে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে থাকেন। একটু সচেতন হলে এটি এড়ানো যায়। এই যেমন হাত পরিষ্কার করে খাবার খেলে। বাসি, পচা খাবার না খেলে।

ডায়রিয়া

সাধারণত পরিপাকতন্ত্রে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা পরজীবী সংক্রমণের কারণেই ডায়রিয়া হয়ে থাকে। আমাদের দেশে এ সময় ব্যাপক হারে ডায়রিয়ার প্রধান কারণ রোটা ভাইরাস, কখনো কখনো অন্যান্য ভাইরাস। তবে পাতলা পায়খানার সঙ্গে রক্ত গেলে বা প্রবল জ্বর দেখা দিলে তা ভাইরাস নয়, বরং ব্যাকটেরিয়া বা পরজীবী সংক্রমণের কারণে হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

কারণসমূহ

- অস্বাস্থ্যকর ও অপরিচ্ছন্ন জীবনযাপন।
- যেখানে-সেখানে ও পানির উৎসের কাছে মলত্যাগ।
- সঠিক উপায়ে হাত না ধোয়া।
- অপরিচ্ছন্ন উপায়ে খাদ্য সংরক্ষণ এবং ঘন ঘন লোডশেডিংয়ের কারণে এ সময় দোকান, রেস্তোরাঁ বা বাসায় ফ্রিজের খাবারে পচন ধরা ইত্যাদি ডায়রিয়া হলে কী করবেন। ডায়রিয়া হলে শরীর দ্রুত পানিশূন্য হয়ে যায় এবং রক্তে লবণের তারতম্য দেখা দেয়। এ দুটোকে রোধ করাই ডায়রিয়ার মূল চিকিৎসা।

প্রাথমিক পরিচর্যা

- প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর বয়স অনুযায়ী পরিমাণমতো খাবার স্যালাইন পান করাতে হবে।
- দুই বছরের নিচেঃ ১০-২০ চা চামচ (৫০-১০০ মি.লি.)।
- দুই বছর থেকে ১০ বছরঃ ২০-৪০ চা চামচ (১০০-২০০ মি.লি.)।
- বা তার বেশি বছরের নিচেঃ যতটুকু খেতে পারে।
- খাবার স্যালাইন ছাড়াও ঘরে তৈরি তরল খাবার যেমন ডাবের পানি, ভাতের মাড়, চিড়ার পানি, তাজা ফলের রস ইত্যাদি দেওয়া যেতে পারে।
- শিশুর বয়স ৬ মাস থেকে ৫ বছর পর্যন্ত হলে, প্রতিদিন একটি করে জিংক ট্যাবলেট (২০ মিঃ গ্রাঃ) ১০ দিন দিতে হবে।
- স্বাভাবিক খাবারও পাশাপাশি চালিয়ে যেতে বলতে হবে।
- বুকের দুধ খাওয়া শিশুরা খাবার স্যালাইনের পাশাপাশি বুকের দুধও খাওয়ার জন্য বলতে হবে।
- এ ছাড়া পাতলা পায়খানার সঙ্গে রক্ত, জ্বর, প্রচণ্ড পেটব্যথা বা কামড়ানো, পিচ্ছিল মল, মলত্যাগে ব্যথা ইত্যাদি থাকলে পরামর্শ অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করতে বলতে হবে।
- যথেষ্ট প্রস্রাব হচ্ছে কি না লক্ষ করতে বলতে হবে। প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া, চোখ গর্তে ঢুকে যাওয়া বা জিভ ও ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়া পানিশূন্যতার লক্ষণ। এসব লক্ষণ দেখা দিলে বা বমির কারণে পর্যাপ্ত স্যালাইন না খেতে পারলে হাসপাতালে যোগাযোগ করতে বলতে হবে।

ডায়রিয়া প্রতিরোধে করণীয়

- রাস্তাঘাটের শরবত, পানি, খাবার ইত্যাদি পরিহার করতে বলতে হবে।
- পচা-বাসি খাবার পরিহার করার জন্য বলতে হবে।
- হাত ভালোভাবে পরিষ্কার করে খাবার খাওয়ার জন্য উপদেশ দিতে হবে।
- ছয় মাসের কম বয়সী শিশুকে শুধু মায়ের দুধ ও স্যালাইন খাওয়াতে বলতে হবে।
- যদি সম্ভব হয় তবে শিশুকে অসুস্থ লোক বা রোগী থেকে দূরে রাখতে হবে।
- খাবার তৈরির আগে, শিশুকে খাওয়ানোর আগে এবং পায়খানার পর সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য পরামর্শ দিতে হবে।
- সব সময় সেদ্ধ ঠান্ডা পানি ব্যবহার করার পরামর্শ দিতে হবে।
- পাকা পায়খানা ব্যবহার করতে বলতে হবে।

তথ্যসূত্রঃ icddr,b

ব্যবস্থাপত্র লিখন ও রেফারেল

ব্যবস্থাপত্র লিখনঃ চিকিৎসার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ

একটি আদর্শ ব্যবস্থাপত্রের নমুনা

ডাক্তারের নামঃ	**চেম্বারের ঠিকানাঃ**
রোগীর নামঃ	বয়সঃ লিঙ্গঃ ওজনঃ তারিখঃ
ঠিকানাঃ	
রোগীর সমস্যাসমূহঃ	R_X
শারীরিক পরীক্ষার ফলাফলঃ	১)
ল্যাবরেটরি পরীক্ষা ও তার ফলাফলঃ	২)
সম্ভাব্য রোগঃ	৩)
পরামর্শঃ	
	ডাক্তারের স্বাক্ষর

রেফারেল (Referral)

রেফারেল হচ্ছে এক কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রে রোগীকে প্রেরণ করার ব্যবস্থা। ব্যাপক অর্থে, মৃত্যু ও অসুস্থ্যতা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে অপর্যাপ্ত সুবিধাসম্পন্ন কেন্দ্র থেকে পর্যাপ্ত ও উচ্চ পর্যায়ের কেন্দ্রে রোগীকে প্রেরণ করার একটি সমন্বিত ব্যবস্থা।

রেফার করার কারণসমূহ

- চিকিৎসা কেন্দ্রে রোগী ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় সুবিধা না থাকলে।
- চিকিৎসা কেন্দ্রে যথাযথ ব্যবস্থাপনা প্রদানের জন্য উপযুক্ত দক্ষ জনবল না থাকলে।
- চিকিৎসা কেন্দ্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ না থাকলে।
- মৃত্যু ও অসুস্থ্যতার আশংকা হ্রাস করার জন্য।

রেফারেল কার্ডে যা লিখতে হবে

- রেফারেল এর কারণ।
- রোগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও শারীরিক পরীক্ষার ফল।
- প্রদত্ত চিকিৎসার বিবরণ।
- যে প্রতিষ্ঠানে রেফার করবেন তার নাম লিখতে হবে কোন রিপোর্ট থাকলে, তা রেফারেল কার্ডের সাথে যুক্ত করে দিতে হবে।

রেফারেল ও করনীয়

- রেফারেলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রোগী ও তার পরিবারকে ব্যাখ্যা করতে হবে।
- রেফার না করলে কি কি সমস্যা ও বিপদ হতে পারে, তা বুঝিয়ে বলতে হবে।
- সম্ভব হলে রেফারেল কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করা।
- সম্ভব হলে রোগী প্রেরনের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করা।

রেফারেলের স্তরসমূহ

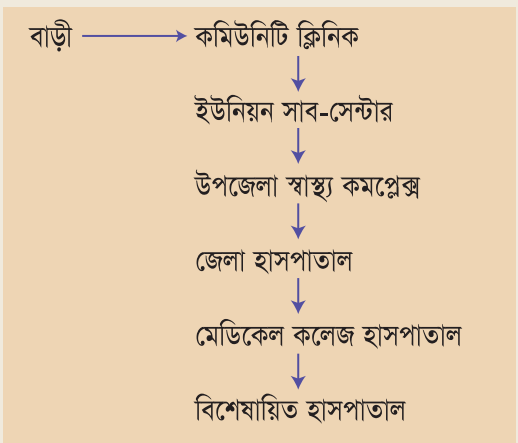

তথ্যসূত্রঃ icddr,b

এসিআই লিমিটেড